OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 164 - 175
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্পে শিক্ষক : একটি সামগ্রিক আলোচনা

রণজিৎ দাস
Email ID : ranjitdas7384@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Teacher, Idealism, Values, Aesthetics, Reality, Initiative, Harmony, Humanity, Dedication, Sense of duty.

Abstract
Education is the main force of the entire human society and human life. Education brings people from darkness to the path of light. Education helps in forming various senses like moral, aesthetic, intellectual, social etc. among the people and the main responsibility of imparting this Senses among people is on the teachers. That is why teachers are called the backbone of our society. Just as the spine plays a very important and vital role in the human body, teachers also play a vital role in society. Teachers have dedicated themselves to the welfare of society. Through their education, teachers transform people into human resources. Therefore, the importance of teachers in society is immense. So, the character of the teacher has emerged in Bengali literature at various times by various writers. Here we will try to discuss the significance of the character of the teacher in Bengali literature.

Discussion

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এক সুমধুর ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে, সেটির বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল প্রাচীনকালেই। যদিও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধরণ আদিতে এরকম ছিল না। প্রাচীন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুকুল প্রথার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে জীবনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করতে গুরুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত হত। সে সময় ছিল বেদের সময়, মৌখিকভাবে শিক্ষা লাভের সময়। তারপর ধীরে ধীরে নানান পালা বদল দেখা যায় শিক্ষা ব্যবস্থায়। গুরুকুল প্রথায় গাছের নিচের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি। ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল সেই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা পেয়েছি 'তক্ষশীলা', 'নালন্দা' ও 'বিক্রমশিলা'-এর মতো শিক্ষায়তন এবং কৌটিল্য, পাণিনি, চরক ও সুশ্রুতদের মতো গুণী শিক্ষকদের। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নানান পরিবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল বদল ঘটতে থাকে। আধুনিক যুগের প্রারম্ভিকে এসে আমরা পাই 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' এবং এই কলেজের হাত ধরেই শেষপর্যন্ত পেয়েছি বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই সময়ে শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চন্ডীচরণ মুন্সী, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় এবং গোলকনাথ শর্মার মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গরা।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হয়েছে বারংবার এবং প্রতিনিয়তই আমরা পেয়েছি সংস্কারকমূলক নানান সাধক তথা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দদের। একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে আমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি নবদ্বীপ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিখ্যাত 'বুনো রামনাথ' তথা রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত-কে। ভারতচন্দ্রের স্ত্রী একবার সাংসারিক অভাব অনটনের অভিযোগে পতিনিন্দা করে বলেছিলেন-

"তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।।
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।।
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলংকার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার।।
শাখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু।।"[১]

রামনাথ সম্পর্কেও শোনা যায় একই কথা। তিনি নাকি তেঁতুল পাতা খেয়ে শিক্ষা দিতেন বিনা পয়সায়। দারিদ্রতা ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী, তবুও চরম সংকটের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন অকাতরে এবং কোন পয়সা না নিয়ে। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় এবং মহৎ আত্মা অবশ্যই আমাদের আদর্শ। তবে সাহিত্য শুধুমাত্র আদর্শের কথাই বলেনা, বাস্তবের কথা এবং সমাজের কথাও বলে। শিক্ষক সম্প্রদায় বাস্তব বহির্ভূত কোন কিছু নয়। রক্তমাংসে গড়ে ওঠা এই শিক্ষকরাও দোষে-গুণে সম্পন্ন মানুষ। বাস্তবোচিত এই সত্যটিকে মান্যতা দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তথা আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে তুলে ধরা হয়েছে শিক্ষক সম্প্রদায়কে। যেখানে তারা শুধু আদর্শের ধারক এবং বাহক নয়, অনেক সময় দেখা যায় তারা হয়ে উঠেছে আদর্শভ্রষ্ট, অসৎ এবং কপট চরিত্র।

'সাহিত্য' শব্দটির খোলস ছাড়ালে পাওয়া যায় 'সহিত' ভিত্তিটিকে। সহিত অর্থাৎ সাথে। সুতরাং সাহিত্য হল শব্দের সাথে শব্দের, শব্দের সাথে অর্থের, অর্থের সাথে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সাথে শব্দার্থের একটি সম্পর্ক। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের এই বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন -

> "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"[২]

তবে এই কাজ করতে গিয়ে সাহিত্য বাছাইধর্মী হলে চলবে না। বাস্তবে যেমন, সাহিত্যে তেমনটাই হওয়া চাই। বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে সাহিত্য তার মর্যাদা হারাবে। সাহিত্য মানুষের জীবনের গণ্ডির বাইরের জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করে না –

> "সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।"[৩]

মানুষের হৃদয়ের প্রবাহ যেমন বিচিত্র তেমন মানব চরিত্রও বৈচিত্র্যময়। তাইতো শিক্ষক চরিত্রকে শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা কখনোই ঠিক হবে না। প্রতিটি শিক্ষক যেমন একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্ন, মৌলিক তেমনি বিভিন্ন রচয়িতার রচনাশৈলীর মধ্যেও দেখা যায় বৈচিত্র্যতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত - তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আবাসিত হইয়া উঠিতেছে।"[৪]

এই সমস্ত কিছুর মিলিত কারণের ফলেই বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট প্রতিটি শিক্ষক চরিত্রকে মৌলিকভাবে এবং স্বতন্ত্র নজরে দেখা প্রয়োজন। এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত শিক্ষক চরিত্রগুলো দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই বাস্তবিক চরিত্র। তবে এর পরবর্তী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অংশে আমরা যে সমস্ত শিক্ষক চরিত্রের কথা বলবো, সেগুলি সমস্তই সাহিত্যিক চরিত্র। সাহিত্যিক চরিত্র শুনেই সেগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো কারণ নেই। বরং সাহিত্যিক চরিত্রগুলিই হয়ে ওঠে বাস্তবের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল। কেননা

> "সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়।"[৫]

তাই –

> "রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।"[৬]

নিচে আমরা বাংলা ছোটগল্পে ফুটে ওঠা শিক্ষক চরিত্রগুলোকে বেশ কিছু রচনাকারের রচনার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

বুনো রামনাথ সম্পর্কে তাঁরই বংশধর বলেছেন –

> "বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক পণ্ডিত ছিলেন। তার একটা সংস্কৃত টোল ছিল। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শিষ্য শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। কিন্তু রামনাথ তাদের কাছ থেকে কোনরূপ গুরুদক্ষিণা নিতেন না। অথচ সংসারে ছিল নিত্য অভাব। তেঁতুল পাতার ঝোলই ছিল একমাত্র ব্যঞ্জন। তাই দিয়েই তারা সশিষ্য অন্ন সেবা করতেন। তবুও তাঁর খ্যাতি ছিল সমগ্র দেশজুড়ে।"[৭]

আবার তাঁর পরিবারের কথা বলতে গিয়ে রামনাথের স্ত্রীর কথা বলেছেন। যিনি তাদের চরম অভাবের মধ্যেও সহজ ভাবে বলতে পারতেন –

> "তাদের কোনই অভাব নেই। তাদের জল খাওয়ার জন্য ঘটি আছে, শোওয়ার জন্য চ্যাটাই আছে, আর তার হাতে এয়তির শাঁখা-পলা না থাকলেও একগাছি করে লাল সুতো ও সাদা সুতো আছে। যা তার এয়োতির চিহ্ন। ফলে তাদের কোনো অভাবই নেই।"[৮]

বাংলা সাহিত্যেও বুনো রামনাথের মতো অতি দরিদ্র অথচ ন্যায় পরায়ণ শিক্ষকের কোনো অভাব হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'টিচার' গল্পটিতে আমরা দারিদ্র্যসীমারও দু-এক ধাপ নিচে অবস্থানকারী গিরীন-এর মতো শিক্ষকদের পাই। এই গল্পে শিক্ষক গিরীনকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটি সত্যিই বেদনাদায়ক। দীন-দুঃখী অতি দরিদ্র এক শিক্ষক হলেন গিরীন। অথচ স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর-এর মতো বিষয় আসক্ত লোকেরা শিক্ষকদের বিবেচনা করে শুধুমাত্র আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে। ক্ষুধার জ্বালায় শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য দাবি, ভাত কাপড়ের দাবি জানালে সেটাকে ব্যভিচারী বলে মনে করা হয়। গল্পের চরিত্র রায়বাহাদুর-এর কথায় –

> "টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙর যে ধর্মঘট করবে?"[৯]

নিজের প্রাপ্য দাবি জানানোতে, না খেতে পেয়ে মরতে রাজি না হওয়াতে রায়বাহাদুর গিরীন-এর মতো শিক্ষকদের মার্কা দিয়ে দেয় আদর্শভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী এবং স্বার্থপর হিসেবে। কেননা এরা মনে করে শিক্ষক মানে স্বার্থ ভুলে, বিলাসিতা ভুলে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্রতাকে যারা হাসিমুখে স্বীকার করে। বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তাদের দু-চারটা পয়সার জন্য না খেতে পেয়ে মরলেও আদর্শ ভুলে গিয়ে অসভ্য মজুরদের মতো হাঙ্গামা করা উচিত নয়। অথচ বাড়িতে এই সমস্ত শিক্ষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে মরতে বসেছে আর কী! টাকার অভাবে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড় পাচ্ছে না। তবুও তাদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে বজায় রাখতে হবে আদর্শ, এই হল সমাজের বিধান। রায়বাহাদুরের কথার মধ্য দিয়ে আমরা গিরীনের যে পরিচয় পাই –

> "এত ছোট, এত পুরনো, এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর তা জানত না।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার আরেক জায়গায় জানায় –

> "রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোন বৌ-ঝি।"[১১]

রায়বাহাদুর এর মতো লোকেরা, যারা শিক্ষকদের বুনো রামনাথের আদর্শের কথা বলে, সেই রায়বাহাদুরই আবার শিক্ষকদের সম্পর্কে পোষণ করে বিরূপ মনোভাব। সামান্য একটা কলার কাঁদি দিয়েও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না শিক্ষকদের। তাই কলার কাঁদিটাও পেকে যাওয়ার আগে কেটে এনে রেখে দেন এই ভয়ে যে সেটি যদি আবার কোন ক্ষুধার্ত শিক্ষকের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের উপায় হয়ে যায়! অন্যদিক দিয়ে ভাবলে রায়বাহাদুর কোন কিছুকেই বেশি ঢিলে দিতে চান না, অবকাশ দিতে চান না পাকার। নতুবা তারা যদি গিরীন-এর মতো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে রায়বাহাদুরের রাতে ঠিকঠাক ঘুমও আসে না। তাই শেষপর্যন্ত প্রতিবাদ করতে গিয়ে গিরীনকে তার চাকরি হারাতে হয়। তবে গিরীন জানেন এরপর থেকে রায়বাহাদুরের বিবেক কিছুটা হলেও জাগ্রত হবে এবং "শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে যাবে কথাগুলো, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মাস্টারমশাই' গল্পে হরলালকে চিত্রিত করেছেন ট্রাজেডির এক অতলস্পর্শী বেদনার সংমিশ্রণে। মাস্টারমশাই হরলাল অতি দরিদ্র মর্মস্পর্শী এক চরিত্র। যিনি কলেজের শিক্ষার খরচ চালানোর জন্য শিক্ষকের চাকরির উমেদারি নিয়ে হাজির হয় ধনী মজুমদার বাড়িতে। মাস্টারমশাই-এর পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পকার জানান –

> "গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারের উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্ট্রান্স স্কুলে কোনমতে এন্ট্রান্স পাস করাইয়াছে।"[১৩]

ভাগ্যক্রমে চাকরিটা হয়েই যায় হরলালের এবং ছাত্র বেণুগোপাল-এর সাথে অতি গভীর একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক যে কতটা সুমধুর এবং মাধুর্যময় হতে পারে, সেই দিকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় খুব ভালোভাবেই ব্যক্ত হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। কিন্তু এখানেও বিপত্তি। সততা এবং সদিচ্ছাকে চলে বেআব্রু করার চেষ্টা। কথায় কথায় আমরা অনেক সময় বলে থাকি একজন শিক্ষার্থীর জীবনে পিতা-মাতার পরেই দায়িত্ব হয়ে থাকে শিক্ষকের। কিন্তু বেণুগোপালের মায়ের মতো চরিত্ররা কখনোই এই সত্যটিকে বুঝে উঠতে পারেন না। আবার কানে বিষ ঢালার জন্য সর্বদাই রয়েছে রতিকান্তর মতো খল চরিত্ররা। তাই তারা বলতে পারেন –

> "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘন্টা, বিকালে এক ঘন্টা পড়াইবে-দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন।"[১৪]

একজন শিক্ষক যার কর্তব্য শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ তৈরি করা, আদর্শ মননশীল হতে সাহায্য করা এবং নান্দনিকতার বিকাশ ঘটানো, সেই শিক্ষকের প্রতিই সমাজ আঙ্গুল তুলে অপবাদ দেয় মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, আদর্শভ্রষ্টতা এবং লোলুপতার। দরিদ্র হরলাল প্রতিনিয়তই মানুষের ব্যবহার এবং কুরুচিপূর্ণ নানান মন্তব্যের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছেন। নিজের আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে হরলাল উপলব্ধি করেছেন যে মানুষের কাছে শিক্ষকরা গোয়াল ঘরে বাঁধা গরুর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়। এই উপলব্ধি সমগ্র শিক্ষক জাতির আত্মপোলব্ধি। এখানে এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে সমগ্র শিক্ষক জাতির বেদনা ফুটে উঠেছে। হরলাল ব্যাথিত হৃদয়ে ভেবেছেন –

> "গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে।"[১৫]

মাস্টারমশাই হরলালের ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে তিনি যেখানে নিঃস্বার্থভাবে তার সমস্ত কিছু উজাড় করে বেণুগোপালকে শুধুমাত্র আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে বিনা অপরাধে তাকে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উঠে আসে চুরির অপবাদ, ছেলেকে বশীকরণ করার অপরাধ। সবশেষে ছাত্র বেণুগোপালের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতি শিক্ষক হরলালের অগাধ স্নেহের প্রতিদান হিসেবে তিনি পেয়েছেন শুধুমাত্র লজ্জা, বঞ্চনা এবং প্রতারণা। এই সমস্ত কিছুর পরিণতি স্বরূপ দেখা যায় –

> "হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।"[১৬]

সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি অন্য সকলের চেয়ে। শিক্ষাই একমাত্র শক্তি, যার জ্যোতিতে আমরা সমাজের অন্ধকারকে চিরতরে বিলীন করে দিতে পারি। একজন শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই আদর্শ মানবিকতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। প্রতিটি মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। একজন শিক্ষকই পারেন ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব প্রোথিত করে দিতে, যাতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক আদর্শ মানবিক মূল্যবোধ। এইরকমই এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কান্ডারী ছিলেন শঙ্খ ঘোষ-এর 'সম্প্রদায়ের ভাষা' গল্পের হেডমাস্টারমশাই। দেশভাগের মর্মান্তিক বেদনার সময় যখন চারিদিকই মুখরিত 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর 'বন্দে মাতরম্' - এর মতো ধ্বনিতে, তখন হেডমাস্টারমশাই-কে যত্ন নিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ সাধনে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভাষাগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে আমরা সমস্ত মানুষই যে এক, এই দিকটি উন্মোচিত করতে হেডমাস্টারমশাইকে গভীর উদ্যোগী দেখা যায়। তিনি বলেন –

> "ভাষাটাকে যে ভালো করে শিখবে, সেই তো তাকে ভালো করে জানবে? এর মধ্যে আর হিন্দু মুসলমানের কী? ভাষা তো কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য গণ্ডিবাঁধা নয়!"[১৭]

সমাজের বক্রদৃষ্টি এবং অসৎ ব্যক্তিদের নিন্দাবাদ-এর পরোয়া না করে হেডমাস্টারমশাই ভাষাকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন মুক্তভাবে এবং সবার কাছে সমান ভাবে। তাইতো তাঁর বিদ্যালয়ে দেখা যায় –

> "মৌলবি সাহেবের কাছে আরবি ফারসি শিখতে যায় জিতেন আর আশিস, পন্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাসে গিয়ে বসে আনোয়ার।"[১৮]

সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার কৌশল, মাধ্যম এবং প্রণালীরও নানান পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ এখন বলে শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আকর্ষণীয়। যেখানে থাকবে না কোন লিঙ্গগত অসাম্যতা বা কারো প্রতি কটুক্তিমূলক কোনো ইঙ্গিত। তবে এতসব সত্ত্বেও প্রতিটি শিক্ষকের মধ্যেই রয়েছে মৌলিকতা, নিজস্বতা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'দাম' গল্পে আমরা তেমনই এক অঙ্কের মাস্টারমশাইকে পাই, যিনি মনস্তাত্ত্বিকতার চেয়ে লাঠির শক্তি এবং হাতের জোরকেই বেশি মান্যতা দিতেন। শিক্ষার্থীদের কাছে অঙ্ক বিষয়টা এমনিতেই একটু কঠিন, তার উপরে দাপুটে মাস্টারমশাই-এর প্রভাবে সেটি হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। কথক সুকুমার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "অঙ্কে যারা একশোর মধ্যে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইতো না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে।"[১৯]

সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে মাস্টারমশাই-এর অনেক খামতি ছিল। যেমন তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী মনস্তাত্ত্বিক ছিল না, তিনি লিঙ্গগত সাম্যতার কথা চিন্তা করতেন না। তাই তিনি বলতেন –

> "পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে-তার উপরে কাঁদতে লজ্জা করে না?"[২০]

কথকের মতো মাস্টারমশাইকে তাই সদুপদেশ দেওয়াই যায় –

> "অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়।"[২১]

তবে মাস্টারমশাই-এর উদ্দেশ্য অসৎ ছিল না। তিনি বরাবরই ছিলেন শিক্ষার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষী। উনার মতো আদর্শ শিক্ষক সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েও সামান্য একটু বিচলিত হননি। বরং আরও বলেছেন –

> "অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র-ওরা সন্তান- বড়ো হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি।"[২২]

তাইতো গল্পের শেষে এসে কথক সুকুমার যিনি একসময় মাস্টারমশাইকে নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, তিনিও তাকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতে বাধ্য হন এবং বিদ্ধ হন আত্মগ্লানিতে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সেই স্নেহ- কোটি মণি মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না; সেই মমতা- যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা- কুবেরের ভান্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।"[২৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর আরেকটি গল্প 'ভাঙ্গা চশমা'য় মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারকে দেখা যায় তিনি একাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভাঙা সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শ স্থির দীপশিখা হয়ে। শিক্ষকতাকে তিনি দেখেন তাঁর ব্রত হিসেবে আর শিক্ষার আলয় তাঁর কাছে মন্দিরের মতো পবিত্র এক স্থান। জীবনের বিনিময়েও এই আদর্শকে রক্ষা করতে তিনি সদা প্রস্তুত। দুর্ভিক্ষের মহাপ্লাবন মাস্টারমশাই-এর নিষ্ঠার এতটুকু নড়চড় করতে পারেনি। গল্পে এক জায়গায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন –

> "বৌয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, হেডমাস্টার হব। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন?"[২৪]

ধূলিধূসরিত কাপড় পরণে, আলুথালু বেশের অধিকারী মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার, যাকে দেখে মনে হয় তিনি দূরের কোন বাঁকের শ্মশানঘাট থেকে উঠে আসা মৃত বাংলার কোন এক প্রেতমূর্তি। তাঁর মনে যে এত পরিমাণ নিষ্ঠা, আকাঙ্খা এবং উদ্যমতা লুকিয়ে থাকতে পারে একথা চোখের সামনে না দেখলে হয়তো কথক বিশ্বাসই করতে পারতেন না। কথক, যিনি নিজেও পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির কুটিলাবর্তে নিজের পেশার বদল করে নিয়েছেন, শেষ অবধি তিনি আত্মসমালোচনায় বিধ্বস্ত হয়ে হেডমাস্টারমশাই-এর সামনে থেকে পালিয়ে চলে আসেন। কথকের মনে হয় –

> "মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই - আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সবকিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।"[২৫]

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - 'মিষ্টান্নমিতরে জনা:"[২৬] অর্থাৎ হাতে হাতে মিষ্টিটা না পেয়ে শুধুমাত্র ভান্ডারে কি পরিমান জমা আছে সেটি আন্দাজ করে কোনো লাভ নেই। প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ।"[২৭]

প্রাবন্ধিকের এই বাণীকে গুরুত্ব দিয়েই যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত করেছেন 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে। উমাচরণ মাস্টার ছিল বিচিত্র চরিত্রের এক মানুষ। মাস্টারমশাই-এর বর্ণনায় গল্পের কথক জানান একবার মাস্টারমশাই চালতে বাগানে মাদুর পেতে কাগজ বই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকেন এবং কখনো উপুড় হয়ে, কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে কী সব লিখতে থাকেন। আবার অন্যত্র বলেন –

> "একটা শুকনো খাল মতো নিচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড়বিড় করে আপন মনে কী বলছেন, এমন কী আপন মনে ফিকফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল।"[২৮]

শিক্ষক হিসেবে উমাচরণ মাস্টার কেমন ছিলেন সে পরিচয় গল্পে খুব একটা না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি শিক্ষক হিসেবে তিনি খুব একটা উঁচুদরের ছিলেন না। শিক্ষকতার চেয়ে তার বই বিক্রি করার প্রতি ঝোঁকই ছিল বেশি। 'আক্কেল গুড়ুম'-এর মতো কম দরের একটা বইকে প্রহসন বলে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালিয়ে দিতেন এবং একপ্রকার জোর করেই তাদের কাছে বিক্রি করতেন। তবে সমগ্র গল্পজুড়ে তার কবিয়ানা ভাবটা বহাল থেকেছে বরাবর। যদিও এই কবিত্ব ছিল শুধুমাত্র নীরব কবিত্ব। কেননা কথক শেষে জানিয়েছেন বড় হয়ে উমাচরণ নামের কোন কবিকে তিনি আর খুঁজে পাননি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অপর একটি গল্প 'মাস্টারমশায়' গল্পে আমরা পেয়েছি নতুন হেডমাস্টার প্রশান্তবাবুকে। প্রশান্তবাবুর মধ্য দিয়ে শিক্ষক চরিত্রের মহানতার দিকটি খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি বিধবার ছেলে ছিলেন বলে সমাজ উনার প্রতি বিরূপ ছিল। পদে পদে তাকে নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের এইসব ব্যক্তিগত বেদনা কখনোই প্রভাব ফেলতে পারেনি উনার পবিত্র শিক্ষকতার কর্তব্যে। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের যে কোন সমস্যায় সাহায্যের জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। ছেলেরা অন্যায় করলে তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন কঠোর হয়ে উঠতেন আবার ছেলেরা ভালো কাজ করলে তাদেরকে ভালোও বাসতেন। এই রকমই এক আদর্শ, গুণী এবং দরদী শিক্ষকের মুখে তাই সহজেই শোনা যায় প্রকৃত শিক্ষার সারমর্ম। তিনি উপদেশ দেন –

> "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপ:। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারিদিক গভীরভাবে দেখা।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'অধ্যাপক' গল্পটিতে আমরা দুই ধরণের শিক্ষক চরিত্রের আভাস পাই। একদিকে রয়েছে মহীন্দ্রকুমারবাবুর মতো চরিত্ররা, যারা অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা আদর্শের দাম্ভিকতা নিয়ে বড়াই করতে পছন্দ করে আবার অন্যদিকে নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর মতো চরিত্ররা, যারা নিভৃতে, নিরালায় থেকেও অনবরত নিজেদের কর্ম এবং কর্তব্য সমাধা করে যান। মিথ্যা দাম্ভিকতার ফাঁপা ফানুসের বড়াই করে মহীন্দ্রবাবুর মতো চরিত্ররা মুখে মুখে পান্ডিত্যের জাহির করেও আবার নির্লজ্জের মতো বলতে পারে –

> "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি। যে সকল বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরী প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।"[৩০]

উল্টোদিকে নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর মতো লোকেরা বাইরে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের খোলস পরিধান না করেও নিভৃতে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যায় আদর্শ, ন্যায় এবং সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা রূপে।

গল্পটিতে একাধারে খল ও আদর্শচ্যুত চরিত্র এবং অন্যদিকে নিষ্ঠাবান ও ব্রতী চরিত্রদের সমান্তরালভাবে অবতারণা করা হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত সত্যের কাছে অসততাকে মাথা নোয়াতেই হয়েছে। তাইতো মহীন্দ্রকুমার যে কিরণকে দেখে আসক্ত হয়েছিল এবং অনবরত চেষ্টা করেছিল কিরণের চারিদিকে একটা ভাবের মোহজাল রচনা করতে, সেই কিরণকে শেষ পর্যন্ত জয় করে নিয়ে যায় কলেজের নবীন অধ্যাপকমশাই। গল্পের শেষে দেখা যায় –

> "কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছলছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।"[৩১]

একজন আদর্শ, ব্রতী এবং প্রকৃত শিক্ষক সমাজের বা পরিস্থিতির যেকোন প্রতিকূলতাতেও ভুলে যায় না তার কর্তব্য। যেমন করে ভুলেননি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর 'ভাঙা চশমা' গল্পের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার। যুদ্ধপীড়িত এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েও তিনি তার শিক্ষকতার গুরু দায়িত্ব ভুলতে পারেননি। তিনি শূন্য শ্রেণিকক্ষেও শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দিয়ে গিয়েছেন প্রিপোজিশন-এর শিক্ষা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' গল্পের সাগরপুর এম.ই. স্কুলের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্নকেও অনেকটা সেই আদলেই নির্মিত হতে দেখা যায়। মাস্টারি জীবনে তার পদোন্নতির নানান সুযোগ আসলেও তিনি সেগুলি নেননি এই ভেবে যে সেখানে তিনি হেডমাস্টারির মতো দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়তো পাবেন না। যিনি শুধুমাত্র সাগরপুরের মানুষদের কথা চিন্তা করে, সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রতনপুর এবং রাধাগঞ্জের মতো দুটি হাইস্কুলের মাস্টারির চাকরির সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত সভ্যদের বলতে শোনা যায়-

> "হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুর এম.ই. স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।"[৩২]

পরিস্থিতির কুটিল আবর্তে এবং দারিদ্রতার পীড়নে শেষপর্যন্ত সংসারকে বাঁচাতে তিনি বাধ্য হয়ে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে যোগদান করেন তারই একটি পুরনো ছাত্রের ব্যাঙ্কে। জীবনের এই মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হন। তাই একসময় অভিমান করে বলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "না খেয়ে মরবো, তবু মাস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজি আছি। কিন্তু মাস্টারী আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।"[৩৩]

তবে এটা ছিল শুধুমাত্র মাস্টারের মুখের কথা। মাস্টারিটা ছিল তাঁর অন্তরাত্মার সাথে জড়িত। তিনি কোনদিনই তাঁর মন থেকে মাস্টারি মনোভাবটুকু মুছে ফেলতে পারেননি। তাই যখনই যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানে প্রতিবাদী হয়েছেন। ব্যাঙ্কের সিনিয়র ব্যক্তিবর্গদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না। মাস্টারসুলভ এইসব আচরণের জন্যই মাস্টারমশাই-এর বিরুদ্ধে পরিমলবাবু একবার অভিযোগ করেন –

> "এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েও কথায় কথায় তাঁর সমালোচনা করেন মাস্টারমশাই। ছোকরা কর্মচারীদের সামনে তাঁর ইংরেজীর ভুল ধরেন। কথাবার্তার খুঁত ধরেন।"[৩৪]

একজন মাস্টারমশাই যে যেকোনো পরিস্থিতিতেই মাস্টারমশাই, এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন নামক মাস্টার চরিত্রটি। তিনি ব্যাঙ্কে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েও ভুলতে পারেননি মাস্টারি। তাই পদে পদে সংঘর্ষ বেঁধেছে ব্যাঙ্কের অন্যান্য সমস্ত কর্মীদের সাথে। বিরক্তি প্রকাশ করেছে সহকর্মীদের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে, কামুকতা মিশ্রিত নানান কথাবার্তায় এবং প্রতিবাদী হয়েছে কর্মরত বেয়ারাদের অধিকার নিয়ে। তাইতো গল্পের শেষে মাস্টারমশাই বেয়ারাদের প্রতি আক্ষেপ করে পুরনো ছাত্র তথা বর্তমান ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিরূপমকে বলেছেন –

> "ইংরেজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট ক'রে তোলা যায়।"[৩৫]

শুধুমাত্র বাংলা ছোটগল্প নয়, বেশ কিছু বাংলা উপন্যাস ও প্রবন্ধেও আমরা পাই নানান শিক্ষক চরিত্র। অমিয়ভূষণ মজুমদার এর 'নির্বাস' উপন্যাসে আমরা পাই স্কুলমাস্টার ভুবনবাবুকে। ভুবনবাবুর অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব বেশি উচ্চমানের ছিলনা। সংসারের অতিরিক্ত খরচ বহন করার জন্য ভুবনবাবুকে বাড়তি কিছু টিউশন পড়াতে হয়, আবার শীতকালে ভুবনবাবুর গায়ে চাদর তুলে দেওয়ার জন্য বিমলাকে লেপ-এর আশা ত্যাগ করতে হয়। তবুও তাদের সবসময়ই আদর্শের কথা ভাবতে হয়, সভ্যভাবে চলতে হয়। কারণ ভুবনবাবু একজন স্কুলমাস্টার এবং সমাজের চোখে বিমলা স্কুল মাস্টারের স্ত্রী। যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী ছিল না। কিন্তু একজন স্কুলমাস্টারের সাথে থাকতে থাকতে বিমলা নিজেও আদর্শেরই বাহক হয়ে উঠেছে। সমাজের কাছে শিক্ষক চরিত্র মানেই হল সমস্ত নৈতিক, নান্দনিক এবং প্রজ্ঞাগত গুণাবলীর সমষ্টি। তাই বিমলা ওরফে বিমি নিজেই নিজের প্রতি উচ্চারণ করেছে –

> "জানো ভুবনবাবু, একজন স্কুলমাস্টারের বিমিকে ধর্মপত্নীই ভাবা উচিত লোকের। নষ্টচরিত্র স্কুলমাস্টারের চাকরি থাকেনা।"[৩৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে আমরা পাই স্কুলমাস্টার সীতারামকে। তিনি প্রায় জীবনের পুরোটাই কাটিয়ে দিয়েছেন দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে। শিক্ষকতা করতে এসে তিনি করে যাচ্ছিলেন দুঃখের সাধনা। তিনি দুঃখের সাথে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে দুঃখটাকেই জীবনের নিত্য সঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। অনেক সময় তাকে নিজের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করতে শোনা যায়। নিজেকেই তিনি প্রবোধ দিয়ে বলতেন দুঃখের মধ্যেই সুখ আছে। কেননা একটা ফুল ঝরে গেলে তবেই ফল হয় আবার ফলটি খসে পড়লে তবেই নতুন একটি চারাগাছ। সারাজীবন মাস্টারি করে জীবনের সম্বল হিসেবে শেষপর্যন্ত সীতারাম শুধু পেয়েছিলেন একতারার মতো একঘেয়ে সুর, বাউলের মতো বৈচিত্রহীন আস্বাদ এবং একরঙা ছবির মতো সাদাসিধে একটি জীবন। তবুও তিনি শিক্ষকতাকে একদিনের জন্যও ভুলে যেতে পারেননি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তিনি মানুষেরা যখন যন্ত্রের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন, সেই রকম মুহূর্তে মানুষকে সুমধুর প্রকৃতির আলতো স্পর্শ এনে দিয়েছেন। এই প্রকৃতির স্পর্শের সাথে বেশ কিছু মানবিক স্পর্শও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি দিয়েছেন আমাদের। 'গনোরী তেওয়ারী' তাঁর সৃষ্ট এমনই এক শিক্ষক। 'আরণ্যক' উপন্যাসে স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীর দুঃখ দুর্দশাময় পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা জেনেছি তার দৈন্যদশা। তেওয়ারীর নিজের কথায়-

> "আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।"[৩৭]

তার শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানান –

> "শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এদেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্য্যন্ত নাই।"[৩৮]

এই ছিল তৎকালীন শিক্ষকদের অবস্থা। গায়ের 'মেরজাই' যেটা থাকা উচিত ছিল বলে ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছে সেইটুকুও জোগাড় করতে অক্ষম ছিল তারা। তবুও তারা শিক্ষকতাকে বেছে নিতেন শুধু তাদের উদ্দেশ্যটা সৎ ছিল বলে। তাদের ব্রত একটাই, সমাজের মঙ্গল, মানব প্রজাতির মঙ্গল।

সাংসারিক নানান প্রতিকূলতা এবং বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবুর মতো আদর্শবান চরিত্রকে অনায়াসেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে। চন্দ্রনাথবাবুকে বরাবরই বেষ্টন করে থাকতো ন্যায়, নীতি এবং নিষ্ঠাবোধ। মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ-এর আকর্ষণ এতটাই তীব্র ছিল যে, নিখিলেশ স্কুলজীবন ত্যাগ করেও মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেননি। নিখিলেশ মাস্টারমশাই সম্পর্কে বলেছেন-

> "তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন- তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।"[৩৯]

এরাই তো প্রকৃত শিক্ষক যারা ন্যায় কে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য নিজের ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে দিতেও দুবার ভাবেন না। পঞ্চু-কে তার নকল মামির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের ধর্মকে উপেক্ষা করে পঞ্চুর বাড়িতে তাদের সাথে এক আসনে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন মাস্টারমশাই। এর ফলে সমাজ প্রদত্ত কৃত্রিম ধর্মটি খোয়াতে হয়েছিল মাস্টারমশাইকে। তবে তিনি ছিলেন মানবধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। মাস্টারমশাই-এর কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তাঁর সরল, সাদাসিধে এবং উদার মনের পরিচয় –

> "ওর মা হারা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না।"[৪০]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'আমার বাংলা' প্রবন্ধের 'দীপঙ্করের দেশে' অংশে আমরা পাই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মর্মান্তিক এক সময়ের বর্ণনা। মানুষ যখন মারা যাচ্ছে না খেতে পেয়ে, পরিত্যক্ত বাড়িঘর শুকিয়ে যাচ্ছে লোকজনের অভাবে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এক বৃদ্ধের মুখে মিনতি শোনা যায় –

> "দেখুন ও গাঁয়ে মেয়েদের পরবার কিছুই নেই। খাটতে তো হয়। তাই দিনের বেলায় ঘরেও বসে থাকতে পারে না। আপনি গেলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে।"[৪১]

আবার এক জায়গায় প্রাবন্ধিককে বলতে দেখা যায়-

> "শেষপর্যন্ত বাইরে থেকে মাইনে করা ডোম আনতে হল খাল থেকে মড়া ফেলার জন্যে। মহাজনদের গাঁটের কড়ি বেশ কিছু খরচ করতে হল। কিন্তু মানুষ মেরে যা লাভ তারা করেছে তার তুলনায় তা কিছুই নয়।"[৪২]

সমাজের এমন দুঃসময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষেরা যখন নিজেদের দাঁত মুখ বিকৃত করে মানুষের রক্ত শোষণে ব্যস্ত, সেই রকম সময়ে রহমান মাস্টার আবির্ভূত হয়েছেন আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম-দের মতো নিঃস্ব ছেলেমেয়েদের রক্ষাকর্তা এবং অন্নদাতা রূপে। রহমান মাস্টার তাদের শিখিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। একজন শিক্ষকের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মূল্যবোধ, আদর্শ,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি সঞ্চার করে দেওয়া সম্ভব। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে রহমান মাস্টার সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য খুব ভালোভাবেই পালন করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আশ্রয়দাতা হয়েছেন। আবার এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁচার অধিকার যারা ছিনিয়ে নিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাইতো প্রাবন্ধিকের জিজ্ঞেস করা 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' প্রশ্নের উত্তরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায় রহমান মাস্টারের শেখানো বুলি, তারা "হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়লোকদের শেষ করবো।"[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন পটভূমিকাতেই শিক্ষক চরিত্ররা ফিরে ফিরে এসেছেন বারবার। তবে বাংলা সাহিত্য কখনোই বাস্তব ভূমিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র আদর্শের ডালি দিয়ে শিক্ষকদের ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেনি। এখানে যে শিক্ষক চরিত্ররা এসেছেন, তারা এসেছেন বাস্তবতার স্পর্শ নিয়ে। শিক্ষকরাও যে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা সাধারন মানুষ এই সত্যটিকে বাংলার রচয়িতারা কখনোই ভুলে যাননি। তাইতো শিক্ষকরা এসেছেন কখনো আদর্শবাদী, নিষ্ঠাবান এবং ব্রতী হয়ে আবার কখনো এসেছেন ব্রতচ্যুত এবং আদর্শহীন হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে আমরা একদিকে যেমন পেয়েছি বুনো রামনাথের মতোই আদর্শবান কিছু শিক্ষকদের আবার অন্যদিকে পেয়েছি মহীন্দ্রবাবুর মতো অন্তঃসারশূন্য এবং দাম্ভিক শিক্ষকদেরও।

বাস্তব ভূমির স্পর্শ রেখেই বাংলা সাহিত্যে শিক্ষক চরিত্রদের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে তারা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরেছে। প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। সব মিলিয়ে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক চরিত্ররা প্রকৃত শিক্ষক চরিত্রের স্বরূপটিকে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। তারা আমাদের আদর্শ, আমাদের অনুপ্রেরণা। সমান্তরালভাবে বাংলা সাহিত্য রায়বাহাদুরের মতো বিষয়াসক্ত এবং স্বার্থান্বেষী চরিত্রদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আদর্শ, মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, মানবিকতা প্রভৃতি সমস্ত বোধের সঞ্চার ঘটানো অবশ্যই শিক্ষকদের গুরু দায়িত্ব। তাঁরা সমাজের সংস্কারমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন এটি আমাদেরই পরম সৌভাগ্য। মানবের মঙ্গলার্থে, সমাজের কল্যাণে শিক্ষকরা প্রতিনিয়তই কর্ম করে যাচ্ছেন আড়ালে আবডালে অন্তরালে। তবে তারাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে পেটের ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজন এবং বেঁচে থাকার অধিকার। 'শিক্ষকরা শুধুমাত্র আদর্শের ধারক ও বাহক'- তাদেরকে এইরূপ প্রতীকি রূপে না দেখে আমাদের উচিত তাদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। 'গিরীন'-এর মতো তাদেরকে শুধুমাত্র আদর্শের কথা শুনিয়ে ক্ষুধার্ত না রেখে সম-সুযোগ এবং উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা। আমাদের এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বর্তমান সময়েও কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যতিক্রমমূলক আদর্শহীন এবং ব্রতচ্যুত শিক্ষক চরিত্ররা থাকলেও সামগ্রিকরুপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষক চরিত্ররা সর্বদাই নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে মানবজীবন এবং মানব সমাজের মঙ্গলার্থে। তারা ব্রতী হয়েছেন সমাজের কল্যাণে, মানবের কল্যাণে। আমরা মানুষ হয়ে অবশ্যই এইসব আদর্শের পাশে দাঁড়াবো। এই কথাটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটা সত্য, বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতিও ততটাই খাঁটি।

Reference:

১. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ৭ আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ২৪৯
২. লাহা, জগত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৯২
৩. তদেব, পৃ. ৮২
৪. তদেব, পৃ. ৮০
৫. তদেব, পৃ. ৯১
৬. তদেব, পৃ. ৯০
৭. ভট্টাচার্য্য, বিপ্লব, ইতিহাস উপেক্ষিত এক শিক্ষক: পন্ডিত প্রবর বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কথালহরী(সাহিত্য পত্রিকা), মে ১৮, ২০২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. তদেব
৯. বিশ্বাস, তপনকুমার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২৪, পৃ. ১২৬
১০. তদেব, পৃ. ১২৮
১১. তদেব, পৃ. ১২৯
১২. তদেব, পৃ. ১৩২
১৩. সাহা, ঐশানী, গল্পগুচ্ছ, শুভম, ৭ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, কলকাতা পুস্তকালয়, ২০০৭, পৃ. ৪৬৯
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭১
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮৬
১৭. ঘোষ, সুব্রত, সাহিত্যকথা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৮৫
১৮. তদেব, পৃ. ৮৫
১৯. চ্যাটার্জি, নবনীতা, সাহিত্য সঞ্চয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১২
২০. তদেব, পৃ. ১২
২১. তদেব, পৃ. ১৩
২২. তদেব, পৃ. ১৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৫
২৪. মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা- ০৯, প্রথম করুণা মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২০, পৃ. ১৬১
২৫. তদেব, পৃ. ১৬২
২৬. লাহা, জগত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৮৪
২৭. তদেব, পৃ. ৮৪
২৮. সাহা, অর্জুন, বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম শুভম সংস্করণ, ১ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ১৩৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৯
৩০. সাহা, ঐশানী, গল্পগুচ্ছ, শুভম, ৭ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, কলকাতা পুস্তকালয়, ২০০৭, পৃ. ৩১৮
৩১. তদেব, পৃ. ৩১৯
৩২. মিত্র, সুবীরকুমার, গল্পমালা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ০৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৪৬
৩৩.তদেব, পৃ. ১৪৮
৩৪. তদেব, পৃ. ১৫৩
৩৫. তদেব, পৃ. ১৫৬
৩৬. দে, সুধাংশুশেখর, নির্বাস ও অরণ্য রোদন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৪৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৭. সাহা, অর্জুন, বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৯৩
৩৮. তদেব, পৃ. ৪৯২
৩৯. সাহা, অর্জুন, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০, ১ লা বৈশাখ, পৃ. ৬২২
৪০. তদেব, পৃ. ৬৯০
৪১. সিংহরায়, জে. এন., আমার বাংলা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা- ০১, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৬১, পৃ. ৩৩
৪২. তদেব, পৃ. ২৬
৪৩. তদেব, পৃ. ৩০